বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই)

বর্ষ-০৯ সংখ্যা-০২
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩

নিউজলেটার

বন ও বনজ সম্পদের গবেষণায় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

বিএফআরআই এর নতুন পরিচালকের সাথে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মতবিনিময় সভা

নতুন পরিচালক (যুগ্মসচিব) মহোদয়কে ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

নতুন পরিচালক (যুগ্মসচিব) মহোদয়-এর সাথে কর্মকর্তাদের মতবিনিময়

গত ৩ অক্টোবর ২০২৩ খ্রি. বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) এ সদ্য যোগদানকৃত পরিচালক (যুগ্মসচিব) জনাব শামিমা বেগম এর সাথে বিএফআরআই মিলনায়তনে ইনস্টিটিউটের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভার শুরুতে সকল কর্মকর্তার পক্ষ হতে পরিচালক (যুগ্মসচিব) মহোদয়কে ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জনান বিএফআরআই এর বীজ বাগান বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. হাসিনা মরিয়ম।

মতবিনিময় সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করে বিভাগীয় কর্মকর্তা (প্রশাসন) ড. মো. মাহবুবুর রহমান। সভায় উপস্থিত বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট বিভাগের গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে পরিচালক (যুগ্মসচিব) মহোদয়কে অবহিত করেন। এছাড়াও বিএফআরআই এর ম্যানগ্রোভ সিলভিকালচার বিভাগ, খুলনা; প্লান্টেশন ট্রায়াল ইউনিট বিভাগ, বরিশাল; আঞ্চলিক বাঁশ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নীলফামারী এবং লিয়াজোঁ অফিস, ঢাকা হতে কর্মকর্তাগণ অনলাইন প্লাটফর্ম (জুম) এ অংশগ্রহণ করেন।

এ সময় পরিচালক (যুগ্মসচিব) মহোদয় সংশ্লিষ্ট সকলকে দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করে গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য উৎসাহ প্রদান করেন। তিনি বলেন, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের একটি সংস্থা হিসেবে আমাদের গবেষণায় পরিবেশগত দিক বিবেচনায় রাখতে হবে। পরিবেশের ক্ষতি হয় এমন কার্যক্রম হতে আমাদের বিরত থাকতে হবে।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৪ ও ১৫-তে জীবজগতের টেকসই ব্যবহার, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বন উজার রোধ করার মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ রোধ ও পরিবেশ রক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

তিনি গবেষণার মাধ্যমে টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আরো বলেন, অক্লান্ত পরিশ্রম ও সঠিক দিক নির্দেশনার মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে বনায়ন বৃদ্ধি, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণসহ বনজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে নতুন লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে বলেন। এর পরে পরিচালক (যুগ্মসচিব) মহোদয়কে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারী সমিতি, বনানী সংঘ (অফিসার্স ক্লাব) এবং ঊর্ধ্বতন বন গবেষণা সমিতির পক্ষ হতে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

ডি-নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ডি-নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উপস্থিত প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

গত ০৯ এবং ১২ নভেম্বর ২০২৩ খ্রি. বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) মিলনায়তনে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ডি-নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগীয় কর্মকর্তা (প্রশাসন) ড. মো. মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন বিএফআরআই এর পরিচালক (যুগ্মসচিব) জনাব শামিমা বেগম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পরিচালক মহোদয় প্রত্যাশা করেন, পরবর্তীতে যেন বিএফআরআই এর সকল কার্যক্রম ডি-নথির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। তিনি আশা প্রকাশ করেন, অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালাগুলো নিয়মিত বাস্তবায়নের মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মেধা ও দক্ষতা আরও শানিত হবে। দিনব্যাপী আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মশালা দুটিতে বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা, সিনিয়র রিসার্চ অফিসার, রিসার্চ অফিসার, ২য় ও ৩য় শ্রেণির কর্মকর্তা, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তাসহ সর্বমোট ৭০ জন অংশগ্রহণ করেন। প্রথম দিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বন ইনভেন্টরি বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা জনাব শেখ মো. রবিউল আলম এবং পরবর্তী দিনে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আঞ্চলিক লোকপ্রশাসন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চট্টগ্রামের সহকারী পরিচালক জনাব মো. শাহাদাৎ হোসেন।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় নাগরিক/দাপ্তরিক ডাক আপলোড, খসড়া ডাক সংরক্ষণ, আবেদন ট্র্যাকিং, আগত ডাক, ডাক সিল তৈরি করা, ডাক প্রেরণ করা, ডাক ট্র্যাকিং করা, প্রেরিত ডাক দেখা, ডাক নিষ্পত্তি করা, ই-ফাইল (নথি) সিস্টেমে ডাক নথিজাত করার প্রক্রিয়া, ই-ফাইল (নথি) সিস্টেমে নথি তৈরি করা, নথির ধরন তৈরি, নথি তৈরি, নথিতে অনুমোদন দেওয়া ও পূর্বে তৈরিকৃত নথি সম্পাদন করা ইত্যাদি বিষয়গুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

শিয়াললেজী বা ফক্স টেইল অর্কিড

অর্কিড এর সাথে আমরা কমবেশি সকলেই পরিচিত। ইহা এক প্রকারের ফুল। এই পৃথিবীতে কমপক্ষে ২,৫০০ প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন অর্কিড রয়েছে। এই প্রকারের ফুল ঘরের শোভা বাড়ায়। শিয়াললেজী বা ফক্স টেইল অর্কিড Orchidaceae পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এপিফাইট জাতীয় উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Rhynchostylis retusa* (L.) Blume ও ইংরেজি নাম Foxtail Orchid এবং বাংলায় ধ্রুপদী মালা নামেও ডাকা হয়। অর্কিড প্রজাতিটি আসামের রাষ্ট্রীয় ফুল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই অর্কিড বনে জঙ্গলে এবং পুরাতন বড় গাছে পাওয়া যায়। এ অর্কিডের ফুলের শাখায় শতাধিক গোলাপি ফুল ফোটে। এপ্রিল হতে জুন মাস পর্যন্ত এদের ফুল ফোটে এবং ৩-৪ সপ্তাহ পর্যন্ত ফুলের স্থায়িত্ব হয়। বাংলাদেশে প্রাপ্ত অর্কিডগুলোর মধ্যে এটি সবচেয়ে সুন্দর। এদের পাতা লম্বা এবং খাঁজযুক্ত। পাতার কক্ষ থেকে ২৫-৩৫ সে.মি. লম্বা ঝুলন্ত মঞ্জুরিতে পরিপূর্ণ ফুল থাকে। ফুল বেগুনি-সাদা এবং সামান্য সুগন্ধিযুক্ত।

এই অর্কিড সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৩০০ মিটার উচ্চতায়ও পাওয়া যায়। বাংলাদেশ, মায়ানমার, কম্বোডিয়া, চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল, লাওস, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, সিংগাপুর, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড এবং ভিয়েতনামসহ এই অঞ্চলে এই পরগাছাটি পাওয়া যায়। পরাশ্রয়ী এই উদ্ভিদটি অন্য গাছকে অলম্বন করে বেঁচে থাকে এবং সেই গাছের কোন ক্ষতি না করে শিকড়ের সাহায্যে বাতাস থেকে খাবার সংগ্রহ করে। পথের ধারে উঁচু পুরানো গাছের গায়ে শ্যাওলা স্যাঁতসেঁতে মিশ্রিত কোনো বৃক্ষের কাণ্ডে বা শাখা প্রশাখায় এই অর্কিড জন্মাতে দেখা যায়। এই অর্কিড ঘা, ক্ষতস্থান, ফুসকুড়ি, যক্ষা, মৃগীরোগে, হাঁপানি, বুক ধড়ফড়, মাংসপেশির খিঁচুনি, বাত এবং কিডনিতে পাথরসহ বিভিন্ন রোগের বিরুদ্ধে কাজ করে। বর্তমানে স্থানীয় অনেক প্রজাতির অর্কিড বিরল ও বিপন্ন হয়ে গেছে। এর অন্যতম কারণ, প্রাকৃতিক বনের পরিমাণ ক্রমশ কমে আসা এবং ভূমি ব্যবহারের প্রকৃতি বদলে যাওয়া। অর্কিডগুলো পরিবেশ থেকে হারিয়ে যাওয়ার পূর্বেই এগুলো সংরক্ষণের আমাদের সকলের সচেতন হওয়া উচিত।

উৎস: অসীম কুমার পাল, বিভাগীয় কর্মকর্তা, বন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, বিএফআরআই, চট্টগ্রাম।

বাংলাদেশের উপকূলীয় বনের গতিশীলতা এবং পশুচারণের প্রভাব

ক্রান্তীয় ও উপ-ক্রান্তীয় উপকূলে অবস্থিত ম্যানগ্রোভ বন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাস্তুসংস্থান। এটি উপকূলীয় মানুষের জীবন যাপন ও নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী ও সেবা দিয়ে থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় অতিমাত্রায় সম্পদ আহরণ এবং বনভূমিকে রূপান্তরিত করে অন্যান্য উদ্দেশ্যে ব্যবহারের চাপ বাড়ছে। বাংলাদেশে বিশ্বের সবচেয়ে বড় একক প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন রয়েছে। যা সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাসের হাত থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলীয় মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করে।

বর্তমান গবেষণায় দেখা যায় যে, চর কাশেম এলাকায় ৫২টি প্রজাতির বৃক্ষ, লতাপাতা ও গুল্ম প্রজাতির গাছপালা পাওয়া গিয়েছে। অন্যদিকে সোনার চরে ৩৬টি প্রজাতির গাছ পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে সোনার চরে ১৩ প্রজাতির ম্যানগ্রোভ, ৩ প্রজাতির ম্যানগ্রোভ সহযোগী, ৫ প্রজাতির নন-ম্যানগ্রোভ এবং গুল্ম, লতাপাতা লিপিবদ্ধ করা হয়। চর কাশেম এলাকায় ১৩ প্রজাতির ম্যানগ্রোভ, ৩ প্রজাতির ম্যানগ্রোভ সহযোগী, ৫ প্রজাতির নন-ম্যানগ্রোভ, ১২ প্রজাতির ফলদ বৃক্ষ পরিলক্ষিত হয়।

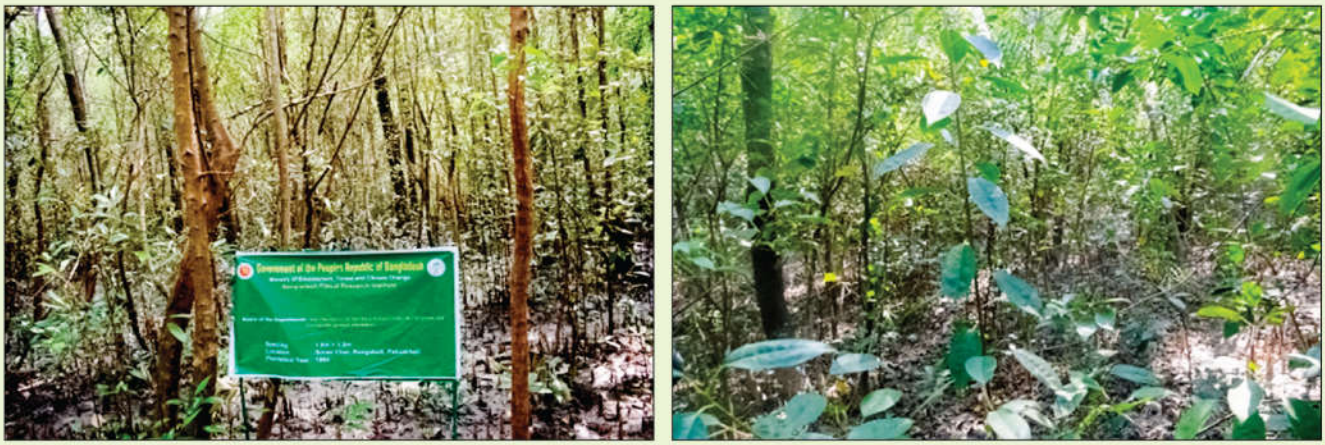

সোনার চরে সুন্দরী বৃক্ষের রিজেনারেশন এবং চর কাশেমে গেওয়া প্রজাতির রিজেনারেশন

বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা দেশের মোট আয়তনের ৩০%। মোট জনসংখ্যার ২৮% লোক এ অঞ্চলে বসবাস করে। উপকূলীয় তটরেখা বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে ৭১০ কি. মি. পর্যন্ত দীর্ঘ। অবস্থানগত কারণে দেশের উপকূলীয় এলাকা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ প্রতি বছরই সামুদ্রিক ঝড়, জলোচ্ছ্বাস উপকূলীয় এলাকায় আঘাতহানে ও জানমালের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। উপকূলীয় জনগণের জানমাল রক্ষার প্রাথমিক লক্ষ্যে সবুজ বেষ্টনী গড়ে তুলতে বাংলাদেশ বন বিভাগ ১৯৬৬ সাল হতে উপকূলীয় চরে বনায়নের কাজ শুরু করে। বন বিভাগ এ পর্যন্ত সমগ্র উপকূলীয় এলাকায় ২,০৯,১৪০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ ও নন-ম্যানগ্রোভ বন সৃজন করেছে। এ বনের ৯৪% হলো কেওড়া প্রজাতির একক বন। উপকূলীয় এ বন বর্তমানে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। সম্প্রতি গবেষণায় স্যাটেলাইট ইমেজ ব্যবহার করে দেখা গিয়েছে যে, উপকূলীয় এলাকায় টিকে থাকা বনের পরিমাণ ৬১,৫৭৪ হেক্টর মাত্র। বাংলাদেশের উপকূীয় বন সৃজনের প্রায় ৫৬ বছর অতিবাহিত হয়েছে। তাছাড়া ৪০ বছর এর উপরে সৃজিত বনভূমির পরিমাণও অনেক। উপকূলীয় বনের গতিশীলতা, রিজেনারেশন, গাছের ঘনত্ব, নতুন প্রজাতির আগমন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট এর প্লান্টেশন ট্রায়াল ইউনিট বিভাগ একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। গবেষণা কার্যক্রমটি উপকূলীয় জেলা পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালী উপজেলার সোনার চর এবং চর কাশেম এলাকায় পরিচালনা করা হয়েছে। উক্ত চর দুটির বর্তমান বয়স (২০২০ সালে) প্রায় ৪৫-৪৬ বছর। সোনার চরকে ২০১১ সালের ডিসেম্বর মাসে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়। অভয়ারণ্য ঘোষণা পূর্বে এই চরে পশুচারণ করা হতো।

গবেষণায় দেখা যায় যে, ২০১৪ সাল হতে ২০১৭ সাল পর্যন্ত উভয় চরে প্রাকৃতিকভাবে চারা গাছ জন্মানোর হার ঊর্ধ্বমুখী যা হেক্টর প্রতি ৩৬,৬২২ থেকে ৪৩,৪৩৯টি থাকলেও ২০১৮ সালে সেটা হেক্টর প্রতি ২০,০০০ এর নিচে গিয়ে দাঁড়ায়। সোনার চর অভয়ারণ্য এলাকায় ২০১৯ এবং ২০২০ সালে প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো চারা গাছের সংখ্যা বাড়তে থাকলেও চর কাশেম এলাকায় তা কমতে থাকে। গবেষণার প্রাথমিক পর্যায়ে হেক্টর প্রতি বৃক্ষ পাওয়া গিয়েছিল যথাক্রমে চর কাশেম এলাকায় ৮১১টি এবং সোনার চরে ৩৫৫টি। পরবর্তীতে ২০২০ সালে তা গিয়ে দাঁড়ায় সোনার চরে ২২৫০টি এবং চর কাশেমে ১৫৬৭টি। এখানে দেখা যায় যে, গবেষণার প্রথম বছরে সোনার চর গবেষণা এলাকায় কেওড়া প্রজাতির ও গেওয়া প্রজাতির (বৃক্ষ) অনুপাত ছিল যথাক্রমে ৬৬.৬৭% এবং ৩৩.৩৩ % এবং গবেষণার শেষ বছরে অর্থাৎ ৮ বছর পরে গিয়ে ৬৯.১১% গেওয়া, ২৩.০৩% কেওড়া, হেঁতাল ৮.৮২%, সুন্দরী ৩.৪৩% এবং ১.৪৭% পানি কাপিলা ও বাইন প্রজাতির গাছ। চর কাশেম এলাকার গবেষণার প্রথম বছরে ২০১৩ সালে গেওয়া প্রজাতির (বৃক্ষ) ছিল ৬২.৫০% এবং কেওড়া ছিল ৩৭.৫%। গবেষণার শেষ বছরে ২০২০ সালে চর কাশেম এলাকার গবেষণা প্লটে মাত্র ৩টি প্রজাতির বৃক্ষ পাওয়া গিয়েছিল যার অনুপাত গেওয়া ৮৫.৭৯%, কেওড়া ১৩.০৬% এবং পানি কাপিলা মাত্র ০.৬১%। গবেষণায় দেখা যায় যে, সংরক্ষিত বনাঞ্চলে গবাদিপশু চারণ করলে বনের ভেজিটেশন এবং রিজেনারেশনের হার কমে যায়। ফলে সংরক্ষিত বনাঞ্চলগুলো পশুচারণ থেকে মুক্ত রাখতে পারলে সংরক্ষিত বনের ভেজিটেশন, রিজেনারেশন এবং মিশ্র প্রজাতির ঘন বন সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

উৎস: প্লান্টেশন ট্রায়াল ইউনিট বিভাগ, বিএফআরআই, বরিশাল।

কেন লাগাবেন গাছ?

গাছ আমাদের পরম বন্ধু। গাছের তৈরি অক্সিজেন গ্রহণ করেই আমরা বেঁচে আছি। ফুলের সৌন্দর্য মনকে প্রফুল্ল করে। ফল মানুষের পুষ্টি জোগায়। বৃক্ষ আমাদের ছায়া দেয়। গাছের সীমাহীন গুরুত্ব সত্ত্বেও আমাদের বনগুলোর অবস্থা আজ হতাশাজনক। বিখ্যাত সুন্দরবন আমাদের গর্ব। কিন্তু এখন আর সুন্দরবনের সেই সৌন্দর্য আর নেই। ভাওয়ালের শাল/গজারির বন আজ ধ্বংসের পথে। মধুপুর আর সিলেটের বনের অবস্থাও ভালো নয়। পার্বত্য জেলাগুলোর বনের অবস্থাও খুবই নাজুক। নির্বিচারে বৃক্ষ নিধনের ফলে প্রতিনিয়ত ঘটছে পাহাড় ধস ও নদী ভাঙনের মতো ঘটনা, ধ্বংস হচ্ছে বসতবাড়ি, প্রাণ হারাচ্ছে মানুষ। এভাবে বাংলাদেশ হারাতে বসেছে তার চিরচেনা রূপ।

প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য একটি দেশের আয়তনের ২৫ভাগ বনভূমি থাকা জরুরি। কিন্তু আমাদের দেশে রয়েছে মাত্র ১৪.১ শতাংশ বনভূমি। বনভূমি কমে যাওয়াসহ নানাবিধ কারণে প্রাকৃতিক বিপর্যয় আমাদের নিত্যসঙ্গী। এখই বিষয়টি গুরুত্বসহকারে ভাবা দরকার। তা না হলে একসময় প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিমাণ বেড়ে যাবে, যা আমাদের জাতীয় জীবনের জন্য বিশাল হুমকিস্বরূপ।

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট এ বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। ইনস্টিটিউটের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো মাটির পিএইচ নির্ধারণ, আর্দ্রতা ও খরা সহনশীলতা, আগুন সহনশীলতা, লবণাক্ততা সহনশীলতা, অঞ্চলভেদে বৃক্ষ নির্বাচন, রোপণ পদ্ধতি, পরিচর্যা, রোগবালাই দমন ও প্রতিকারসহ যাবতীয় কারিগরি সহায়তা ও নির্দেশনা এর মাধ্যমে একটি সমন্বিত প্যাকেজ তৈরি করে জনগণকে প্রদান করলে, বৃক্ষরোপণ আন্দোলন অধিকতর ফলপ্রসূ হবে বলে আশা করা যায়। এছাড়া ভালো বীজের নিশ্চয়তা ও ভালো এবং গুণগত মানসম্পন্ন চারার যথেষ্ট অভাব রয়েছে আমাদের দেশে। ফলে বৃক্ষরোপণে আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হচ্ছে না। দেশের নার্সারিগুলোতে গুণগত মানসম্পন্ন চারা প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া যে চারাগুলো রোপণ করা হচ্ছে তা রক্ষণাবেক্ষণে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। সত্যিকার অর্থে বৃক্ষরোপণের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে গাছ লাগাতে হবে নিজের স্বার্থে ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণে। বৃক্ষরোপণে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সাধারণ মানুষসহ সকল পেশাজীবী মানুষের মধ্যে বৃক্ষরোপণকে একটি কার্যকর আন্দোলন হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। সম্মিলিত প্রচেষ্টা, বিজ্ঞান ভিত্তিক নার্সারি সৃজন এবং সবার আন্তরিকতাই পারে আমাদের কাঙ্ক্ষিত অরণ্য ফিরিয়ে দিতে।

উৎস: অসীম কুমার পাল, বিভাগীয় কর্মকর্তা, বন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, বিএফআরআই, চট্টগ্রাম।

ভেষজগুণ সম্পন্ন উদ্ভিদ: চালমুগরা

চালমুগরা Flacourtiaceae পরিবারের অন্তর্ভুক্ত চিরসবুজ মাঝারি আকারের বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞনিক নাম *Hydnocarpus kurzii* (King) Warb. চাকমাদের কাছে এটি ভুলু, মারমা সম্প্রদায়ের কাছে গ্রাবাং বা বল গাছ নামে পরিচিত। এ গাছটি বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেট বনাঞ্চলে কদাচিৎ চালমুগরার গাছ দেখা যায়। চালমুগরা গাছ সমতলের চেয়ে পাহাড়ি এলাকায় বেশি জন্মে। একসময় দেশে চালমুগরার অনেক গাছ ছিল। বর্তমানে IUCN এর মতে উদ্ভিদটি বিপন্ন হয়ে পড়েছে। চালমুগরা ছোট থেকে মাঝারি আকৃতির চিরহরিৎ বৃক্ষ, উচ্চতায় ১৫-২০ মিটার পর্যন্ত হয়। গুড়ি কাণ্ড বা প্রধান কাণ্ড সরল, সোজা, গোলাকার, তবে ডালপালাগুলো নিচের দিকে ঝুলে থাকে। বাকল পুরু, মসৃণ এবং সবুজাভ-ধূসর বর্ণের। পাতা পুরু, আয়তাকার, লম্বায় ১৮-২৫ সেন্টিমিটার, কিনারা মসৃণ ও আগা সূচালো। জুলাই-আগস্ট মাসে পত্রকক্ষে গুচ্ছাকারে হলুদ বর্ণের ছোট ছোট ফুল ফোটে।

ফল বেরী জাতীয়, গোলাকার, ব্যাস প্রায় ৭.৫ সেন্টিমিটার। নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ফল পরিপক্ব হয়। পাকা ফলের বর্ণ চকলেট ব্রাউন। ফলের ভিতর অনেক বীজ থাকে। প্রতি কেজিতে বীজের সংখ্যা ৩০০-৫০০টি। সাধারণ তাপমাত্রায় বীজ ২০-২৫দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করে রাখা যায়। বন এলাকায় প্রাকৃতিকভাবে চালমুগরার বীজ থেকে চারা ও গাছ জন্মায়। নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে সংগৃহীত বীজ যথাশীঘ্র নার্সারিতে পলিব্যাগে বপণ করতে হয়। চারা গাজানো বা বীজ অঙ্কুরোদগমের হার

চালমুগরা ফল

শতকরা ৪০ ভাগ। চারা গজাতে সময় লাগে ৬০-৬৫ দিন। চারমুগরার গাছ কপিচিং ক্ষমতা সম্পন্ন অর্থাৎ কর্তনকৃত গাছের গোড়ার মুথা থেকে একাধিক কুশি/চারা জন্মায় যা পরবর্তীতে বড় গাছে পরিণত হয়। চালমুগরার যে জিনিসটি মূল্যবান সেটি হলো বীজ। বীজ থেকে ৩০-৪০ ভাগ তেল পাওয়া যায়। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বীজ থেকে চালমুগরার তেল পাওয়া যায়। এ তেল চালমুগরা তেল নামে পরিচিত। ইতিহাস থেকে জানা যায়, প্রাচীন মিসর এবং ভারতে খ্রিষ্ট জন্মের প্রায় ছয়শ বছর আগে থেকেই এ তেল ব্যবহার হয়ে আসছে। বীজের তেল ব্যাপকহারে একজিমা, খোসপাঁচড়া, রক্তঅর্শ, মাথার খুশকি এবং কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। চীন ও আর্জেন্টিনাতে চালমুগরার তেল ক্যান্সার নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। চালমুগরার কাঠ খুব শক্ত, ভিতরে সাদা হলেও বাইরের রং হলুদ। গুরুত্বপূর্ণ ঔষধি উদ্ভিদটি সংরক্ষণে আমাদের সকলের সচেতন হওয়া উচিত।

উৎস: অসীম কুমার পাল, বিভাগীয় কর্মকর্তা, বন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, বিএফআরআই, চট্টগ্রাম।

কোন গাছ কোথায় লাগাবেন

মে-আগস্ট মাস গাছ লাগানোর উপযুক্ত সময়। সুস্থ সবল, মধ্যমাকৃতির সঠিক জাতের চারা সরকারি বা বেসরকারি নার্সারি অথবা ব্যক্তিগত নার্সারি হতে সংগ্রহ করতে পারেন। পরবর্তী বংশধরদের কথা চিন্তা করে বনজ, ফলজ ও ঔষুধি গাছের চারা লাগানোর প্রতি বেশি নজর দিতে হবে। এতে ফল, ওষুধ ও কাঠ সবই পাওয়া যাবে। বন্যামুক্ত, আলোবাতাস চলাচল করতে পারে এবং সূর্যালোক পড়ে এমন জায়গায় চারা লাগানো উচিত। সঠিক জায়গায় সঠিক প্রজাতির চারা রোপণ বনায়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। স্থান ও গাছের বৈশিষ্ট্য বিচারে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে রোপণ উপযোগী চারা রোপণ করা উচিত। আসুন জেনে নিই কোথায় কোন চারা রোপণ করা উচিত।

বসতবাড়ির দক্ষিণ পাশে : বসতবাড়ির দক্ষিণ পাশে রোদ ও আলোর জন্য ছোট এবং কম ঝোপালো গাছ লাগানো উচিত। যেমন: সুপারি, নারিকেল, নিম, দেবদারু, পেয়ারা, লেবু, জাম্বুরা, ডালিম ও মেহেদি গাছ।

বসতবাড়ির পূর্ব-পশ্চিম পাশে : বসতবাড়ির পূর্ব-পশ্চিম পাশে মাঝারি উঁচু এবং মাঝারি ঝোপালো গাছ লাগাতে হবে। যেমন: আম, কুল, তেজপাতা, কামরাঙ্গা, ডালিম, বিলাতিগাব, সফেদা, আমড়া, সজিনা, কাঁঠাল, লিচু, খেজুর, বেল, লটকন, পেয়ারাসহ বিভিন্ন গাছ লাগাতে পারেন।

বসতবাড়ির উত্তর পাশে : বসতবাড়ির উত্তর পাশে বড় ও উঁচু গাছ লাগালে ঝড়-বাতাস হতে রক্ষা পাওয়া যায়। এখানে আম, কাঁঠাল, জাম, নিম জলপাই, মেহেগনি, সেগুন, হরীতকী, বাঁশ ইত্যাদি এবং বর্ষার পানি জমে থাকে এমন জায়গায় কদম, জারুল, পিটালী, বরুন ইত্যাদি গাছ লাগানো উচিত।

সড়ক ও মহাসড়ক: রাস্তার পাশে উঁচু ও ডালপালা ছাঁটাই করে রাখা যায় এমন গাছ রোপণ করতে হবে। যেমন: মেহেগনি, রেইনট্রি, রাজকড়ই, শিলকড়ই, কালা কড়ই, অর্জুন, দেবদারু, ঝাউ, চিকরাশি, তেলসুর, বকুল, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া, সোনালু, নিম, পাম, বাবলা, ইপিল-ইপিল ইত্যাদি গাছ রোপণ করা যেতে পারে।

ফিডার রোড: নিম, দেবদারু, চম্পা, ইপিল-ইপিল, তুন, জাম, বাবলা, খয়ের, তাল, খেজুর ইত্যাদি।

সিটি আইল্যান্ড : উইপিং দেবদারু, বটল-পাম, বটল-ব্রাশ, এরিকা-পাম, কামিনি, নাগেশ্বর, জবা, গন্ধরাজ, বাগান বিলাস, মোসেন্ডা, থুজা, অশোক, রাধাচূড়া ইত্যাদি।

রেললাইন : রেললাইনের ধারে মেহেগনি, তাল, খেজুর, বাবলা, খয়ের, শিমুল, দেবদারু, নিম, সুপারি ইত্যাদি।

বাঁধের ধারে : যেসব গাছের শেকড় শক্ত বিস্তৃত যেমন: বট, বাঁশ, জারুল, তাল, খেজুর, বাবলা, মান্দার ইত্যাদি।

জমির আইলে : যেসব গাছের শিকড় কম বিস্তৃত, কম ছায়াদানকারী, ডালপালা ছাটাইযোগ্য যেমন: মেহেগনি, দেবদারু, নারিকেল, সুপারি, খেজুর, তাল, বাবলা, খয়ের, মান্দার ইত্যাদি গাছ রোপণ করা যেতে পারে।

বিল এলাকায় (যেখানে বছরের ২-৩ মাস পানি জমে থাকে) **রোপণ উপযোগী গাছ :** হিজল, করচ, পিটালী, জারুল, মান্দার, বরুন, পলাশ, কদম, চালতা, পুঁতিজাম, পীতরাজ ইত্যাদি।

নিচু জমিতে রোপণ উপযোগী গাছ: নিচু জমিতে জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে এমন গাছ রোপণ করতে হবে। যেমন: পিটালি, বেত, মুর্তা, মান্দার, জারুল, হিজল, কদম ইত্যাদি গাছ রোপণ করা যেতে পারে।

পুকুড়পাড়ে রোপণ উপযোগী গাছ: পুকুড় পাড়ের মাটি না ভাঙে এবং শোভা বাড়ায় এমন গাছ লাগানো উচিত। যেমন: নারিকেল, তাল, সুপারি, খেজুর, পেয়ারা, জাম্বুরা, লেবু, নিম, দেবদারু, ডালিম।

হাট-বাজারে রোপণ উপযোগী গাছ: ছায়াদানকারী গাছ হাট-বাজারে রোপণ করা উচিত। যেমন: বট, অশ্বথ, তেতুঁল, কাঠবাদাম, রেইনট্রি, নিম, পাম, কৃষ্ণচূড়া ইত্যাদি।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অফিস, হাসপাতাল, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণে রোপণ উপযোগী গাছ: নারিকেল, তাল, কাঠবাদাম, আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, জাম্বুরা, গাব, লিচু, কাউ, চম্পা, মেহেগনি, তেলসুর, জারুল, সোনালু, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া, কামিনি, বকুল, অশোক, নাগেশ্বর, উইপিং দেবদারু, দেবদারু, বটল-ব্রাশ, বটল-পাম, অরোকেরিয়া, থুজা ইত্যাদি।

শিল্প অঞ্চলে রোপণ উপযোগী গাছ: মেহেগনি, নিম, নারিকেল, তাল, বকুল, নাগেশ্বর, দেবদারু, গাব, উইপিং দেবদারু, রাজকড়ই, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া, থুজা, অরোকেরিয়া ইত্যাদি।

কবরস্থান ও শ্মশানে রোপণ উপযোগী গাছ: কাঁঠাল, আম, মেহেগনি, বকুল, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া, নাগেশ্বর, শিমুল, বট, গাব, অশ্বথ, বেল, চম্পা, ঝাউ, বটল-ব্রাশ, বটল-পাম, অরোকেরিয়া, সোনালু, কামিনি, থুজা, সুপারি, বাঁশ ইত্যাদি।

পাহাড়ের উপরিভাগ: গর্জন, গামার, চম্পা, চিকরাশি, সিভিট, তেলসুর, উড়িআম, আমলকী, পাইন্যাগোলা/লুকলুকি, কনক, ধারমারা, শিলভাদি, গুটগুটিয়া ইত্যাদি।

পাহাড়ের মধ্যঢাল থেকে পাদদেশ পর্যন্ত: গর্জন, গামার, কালাকড়ই, চাপালিশ, মেহেগনি, শিলকড়ই, সেগুন, তেলসুর, চম্পা, সিভিট, শিমুল, ছাতিয়ান, জারুল, তেঁতুল, ঢাকিজাম, পীতরাজ, কাইঞ্জলভাদি, তুন, বট, বকুল, তেতুয়াকড়ই, লোহাকাঠ, চিকরাশি, বৈলাম, টালি, বান্দরহোলা, তেজবহল, বাজনা, গুটগুটিয়া, উদাল, চালমুগরা, কন্যারী, পাড়ুক, চুন্দুল, নারিকেলী, কামদেব, রক্তন, ধারমারা, হারগাজা, উড়িআম, বর্ত্তা, কাউ, গাব, কালোজাম, হরিতকি, আমলকি, বহেরা, অর্জুন, বাঁশ,বেত ইত্যাদি।

পাহাড়ি এলাকার নিচু ভূমি (যেখানে বছরের কোন না কোন সময় পানি থাকে): জারুল, কদম, পুঁতিজাম, কালোজাম, পিটালী, ডুমুর, শিমুল, চাকুয়াকড়ই, কালাকড়ই, বান্দরহোলা, মান্দার, হিজল, বট, অশ্বথ, বাঁশ, বেত ইত্যাদি।

উপকূলীয় অঞ্চলে রোপণ উপযোগী গাছ: লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে, হালকা পাতা বিশিষ্ট গাছ যেমন: সুন্দরী, ছৈলা, গরান, গেওয়া, কাকড়া, বাইন, কেওড়া, গোলপাতা ইত্যাদি।

উপকূলীয় এলাকায় জেগে উঠা উঁচু চর (যেখানে ম্যানগ্রোভ জন্মে না): বাবলা, ঝাউ, সাদাকড়ই, কালাকড়ই, জারুল, রেইনট্রি, পিটালী ইত্যাদি।

নদী বক্ষে জেগে উঠা নতুন চরে রোপণ উপযোগী গাছ: ঝাউ, লোনা ঝাউ, পিটালী, করচ ইত্যাদি।

উৎস: অসীম কুমার পাল, বিভাগীয় কর্মকর্তা, বন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, বিএফআরআই, চট্টগ্রাম।

গর্জনের সাতকাহন

গর্জন গাছ Dipterocarpaceae গোত্র বা পরিবারভুক্ত Dipterocarpus গণের একটি বৃহদাকার চিরসবুজ বৃক্ষ। এ গাছ Indo- Malayan অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর নিজস্ব গাছ হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা, মায়ানমার, কম্বোডিয়া, লাওস, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত গর্জন গাছ বিস্তৃত। এ গাছ চিরসবুজ ও মিশ্র চিরসবুজ বনে প্রাকৃতিকভাবে জন্মায়। বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রজাতির গর্জন গাছ চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেট অঞ্চলের চিরসবুজ ও মিশ্র চিরসবুজ বনে প্রাকৃতিভাবে জন্মায়। এ সকল বনাঞ্চলে অল্প সংখ্যক বয়স্ক গর্জন গাছ রয়েছে যা গর্জন প্রজাতির অস্তিত্বের ক্ষেত্রে হুমকিস্বরূপ।

বিশ্বব্যাপী Dipterocarpus গণের অন্তর্ভুক্ত ৮০টি প্রজাতি রয়েছে। তবে, বাংলাদেশে নিম্নোক্ত ৪টি প্রজাতির গর্জন গাছ রয়েছে।

ক্রম. নং	স্থানীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	বর্তমান অবস্থা
১	তেলি, তেইল্যা বা কালি গর্জন	*Dipterocarpus turbinatus Gaertn.*	সংকটাপন্ন
২	দুলি, ঢলি বা ডুলি গর্জন	*Dipterocarpus gracilis Bl.*	মহাবিপদাপন্ন
৩	ধইল্যা, ধলি বা ডুলিয়া গর্জন	*Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don*	বিপদাপন্ন
৪	বাইট্টা, শিল বা গুটি গর্জন	*Dipterocarpus costatus Gaertn.*	মহাবিপদাপন্ন

তথ্য সূত্র: Das & Alam, 2001. Trees of Bangladesh

তেলি বা কালি গর্জন:

তেলি বা কালি গর্জন Dipterocarpaceae পরিবারের অন্তর্ভুক্ত দীর্ঘ বৃক্ষ প্রজাতির উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Dipterocarpus turbinatus* এবং ইংরেজি নাম- Garjan oil tree ও স্থানীয় নাম তেলি গর্জন, তেইল্যা গর্জন, কালি গর্জন ইত্যাদি। এ গাছ হতে তেল পাওয়া যায় বলে এর নাম তেলি গর্জন।

বিস্তৃতি: এ প্রজাতির গাছ বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, কম্বোডিয়া, লাওস, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত।

বাংলাদেশে প্রাপ্তিস্থান: বাংলাদেশের বনাঞ্চলে প্রচুর সংখ্যায় তেলি গর্জন গাছ রয়েছে। তবে সঙ্কটাপন্ন (Threatened) অবস্থায় টিকে আছে। চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেট অঞ্চলের চিরসবুজ ও মিশ্র চিরসবুজ বনে প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো ও লাগানো গাছ রয়েছে। এ ছাড়া চট্টগ্রাম শহর এলাকার রেলভবন ও পাহাড়তলীর কৈবল্যধাম নামক স্থানে বড় আকৃতির শতবর্ষী কিছু গাছ রয়েছে। ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত জাতীয় উদ্যানের ৫৪ নং সেকশনে লাগানো তেলি গর্জন গাছের সংরক্ষিত প্লট রয়েছে।

গাছের বৈশিষ্ট্য:

- বড় আকৃতির চিরসবুজ বৃক্ষ, উচ্চতায় ৪০-৫০ মিটার এবং গাছের বেড় ৪-৫ মিটার পর্যন্ত হয়। এ গাছ ধীরে ধীরে বাড়ে।
- কাণ্ড সরল, সোজা, গোলাকার এবং প্রায় ২০ মিটার পর্যন্ত কাণ্ডে কোন শাখা-প্রশাখা থাকে না। গাছের মাথায় বিস্তৃত শাখা-প্রশাখা দেখতে ছাতার মতো মুকুট (crown) আকৃতির। বাকল মসৃণ ও হালকা ধূসর বর্ণের।
- পাতা আয়তাকার, লম্বায় ১০-২৫ সেন্টিমিটার, বোঁটাযুক্ত, সবুজবর্ণ, কিনার ঢেউ খেলানো, অগ্রভাগ সূচালো এবং স্পষ্ট শিরাবিন্যাসযুক্ত।
- মার্চ-এপ্রিল মাসে গোলাপি বর্ণের ফুল ফোটে।
- ফল নাট জাতীয়, ডিম্বাকার এবং পৃষ্ঠভাগ মসৃণ। ফলের শেষপ্রান্তভাগে পাতা সদৃশ পাতলা লম্বাটে দুটি পাখনা (রিহম) সংযুক্ত। মে-জুন মাসে ফল পরিপক্ব হয় এবং খয়েরি বর্ণের হয়। পাকা ফল বৃন্তচ্যুত হলে ফলের পাখনায় বাতাস লেগে ঘুরতে ঘুরতে বহুদূর ছড়িয়ে মাটিতে পড়ে। প্রতিটি ফল একক বীজ বিশিষ্ট। প্রতি কেজিতে বীজের সংখ্যা ১৫০-১৭০ টি। বীজের আয়ুষ্কাল খুবই কম।

প্রজনন ও বংশবিস্তার: সাধারণত বীজের মাধ্যমে এদের বংশবিস্তার হয়। তেলিয়া গর্জন গাছের বীজের আয়ুষ্কাল খুবই কম বিধায় সংগৃহীত বীজ দ্রুত সময়ে মধ্যে বপন করতে হয়। বীজ গজানোর (অঙ্কুরোদগম) হার শতকরা ৭০-৮০ ভাগ এবং ১০-১২ দিনের মধ্যে চারা গজানো সম্পন্ন হয়। উল্লেখ্য যে, বনাঞ্চলের বড় আকৃতির শতবর্ষী একটি মাতৃ গর্জন গাছ আশেপাশের ১৫-২০ হেক্টর বন ভূমিতে বীজ ছড়িয়ে দিতে পারে। অঙ্কুরোদগমের অনুকূল পরিবেশ বজায় থাকলে প্রতিটি মাতৃ গর্জন গাছ থেকে বনভূমিতে বছরে ১০-১৫ হাজার চারা পাওয়া যায়। এ সকল চারা প্রাকৃতিক উপায়ে বন সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

গুরুত্ব ও ব্যবহার: কাঠ বেশ শক্ত, মজবুত, টেকসই এবং হালকা খয়েরি বর্ণের। গৃহনির্মাণের খুঁটি, দরজা-জানালার ফ্রেম, আসবাবপত্র, বাস-ট্রাকের পাটাতন, ঘরের সিলিং ও প্যানেলিং, জলযান, রেলস্লিপার ও কাঠের ব্রীজ তৈরিতে এই বৃক্ষের কাঠ ব্যবহার করা হয়। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এ লগ দিয়ে ভিনিয়ার করে প্লাইউড বানানো হয়। গাছের বাকল থেকে সংগৃহীত

তেলি বা কালি গর্জন গাছ

বীজসহ তেলি বা কালি গর্জন গাছ

তেলি বা কালি গর্জন এর বীজ

তেলি বা কালি গর্জন এর চারা

অলিওরেসিন (oleoresin) নামক প্রক্রিয়াজাত গর্জন তেল মানব দেহের ক্ষত, দাঁদ ও অন্যান্য চর্মরোগের চিকিৎসায় বাহ্যিকভাবে প্রয়োগ করা হয়। এছাড়া আদিবাসীরা গর্জন তেল আলো জ্বালাতে ও বার্নিশ এর কাজে ব্যবহার করে থাকে।

দুলি বা ঢলি গর্জন:

দুলি বা ঢলি গর্জন Dipterocarpaceae পরিবারের অন্তর্ভুক্ত দীর্ঘ বৃক্ষ প্রজাতির উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Dipterocarpus gracilis* এবং স্থানীয় নাম দুলি গর্জন, ধলি গর্জন, ডুলি বা ঢলি গর্জন ইত্যাদি।

বিস্তৃতি: এ প্রজাতির গাছ বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, কম্বোডিয়া, লাওস, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত।

বাংলাদেশে প্রাপ্তিস্থান: বাংলাদেশে দুলি বা ঢলি গর্জন মহাবিপদাপন্ন (Critically Endangered) অবস্থায় টিকে আছে। একমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে চিরসবুজ ও মিশ্র চিরসবুজ বনে প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো কয়েকটি গাছ দেখা যায়।

দুলি বা ঢলি গর্জন গাছ

দুলি বা ঢলি গর্জন গাছের ফুল

গাছের বৈশিষ্ট্য:

- বড় আকৃতির চিরসবুজ বৃক্ষ, উচ্চতায় ৩৫-৪০ মিটার এবং গাছের বেড় ৩-৪ মিটার পর্যন্ত হয়। এ গাছ ধীরে ধীরে বাড়ে।
- কাণ্ড সরল, সোজা, গোলাকার এবং প্রায় ২০ মিটার পর্যন্ত কাণ্ড শাখা প্রশাখাবিহীন। গাছের মাথায় বিস্তৃত শাখা-প্রশাখা দেখতে ছাতার মতো মুকুট (crown) আকৃতির। বাকল অমসৃণ ও নীলচে ধূসর বর্ণের।
- বয়স্ক পাতার চেয়ে তরুন শাখায় গজানো পাতা আকারে বড়, লম্বায় ৩০-৪৫ সেন্টিমিটার হয়। পাতা বোঁটাযুক্ত, সবুজ বর্ণ, কিনারা ঢেউ খেলানো, অগ্রভাগ সূচালো এবং স্পষ্ট শিরাবিন্যাসযুক্ত।
- মার্চ-এপ্রিল মাসে গোলাপি বর্ণের ফুল ফোটে।
- ফল নাট জাতীয়, ডিম্বাকার এবং পৃষ্ঠভাগ মসৃণ। ফলের শেষপ্রান্তভাগে পাতা সদৃশ লম্বাটে পাতলা দুটি পাখনা (রিহম) সংযুক্ত। মে-জুন মাসে ফল পরিপক্ব হয় এবং খয়েরি বর্ণের হয়। পাকা ফল বৃন্তচ্যুত হলে ফলের পাখনায় বাতাস লেগে ঘুরতে ঘুরতে বহু দূর ছড়িয়ে মাটিতে পড়ে। প্রতিটি ফল একক বীজ বিশিষ্ট। প্রতি কেজিতে বীজের সংখ্যা ১৫০-১৬০টি। বীজের আয়ুষ্কাল খুবই কম।

প্রজনন ও বংশ বিস্তার:

সাধারণত বীজথেকে চারা তৈরি করে বংশ বিস্তার করা হয়। দুলি বা ঢলি গর্জন গাছের বীজের আয়ুষ্কাল খুবই কম বিধায় সংগৃহীত বীজ দ্রুত সময়ের মধ্যে বপন করতে হয়। বীজ গজানো বা অঙ্কুরোদগমের হার শতকরা ৮০ ভাগ এবং ১০-১২ দিনের মধ্যে চারা গজানো সম্পন্ন হয়।

গুরুত্ব ও ব্যবহার: কাঠ বেশ শক্ত, মজবুত, টেকসই এবং হালকা খয়েরি বর্ণের। গৃহনির্মাণের খুঁটি, দরজা-জানালার ফ্রেম, আসবাবপত্র, বাস-ট্রাকের পাটাতন, ঘরের সিলিং ও প্যানেলিং জলযান, রেলস্লিপার ও কাঠের ব্রিজ তৈরিতে এই বৃক্ষের কাঠ ব্যবহার করা হয়। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এ লগ দিয়ে ভিনিয়ার করে প্লাইউড বানানো হয়। গাছের বাকল থেকে সংগৃহীত অলিওরেসিন (oleoresin) নামক প্রক্রিয়াজাত গর্জন তেল মানব দেহের ক্ষত, দাঁদ ও অন্যান্য চর্মরোগের চিকিৎসায় বাহ্যিকভাবে প্রয়োগ করা হয়। এছাড়া আদিবাসীরা গর্জন তেল আলো জ্বালাতে ও বার্নিশ এর কাজে ব্যবহার করে থাকে।

ধইল্যা বা ডুলিয়া গর্জন:

ধইল্যা বা ডুলিয়া গর্জন Dipterocarpaceae পরিবারের অন্তর্ভুক্ত দীর্ঘ বৃক্ষ প্রজাতির উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Dipterocarpus alatus* এবং ইংরেজি নাম- Indonesian gurjun, leafed apitong ও স্থানীয় নাম ধইল্যা গর্জন, ধলিয়া, ধলি গর্জন বা হারবা গর্জন, ডুলিয়া গর্জন, মাশকালিয়া গর্জন ইত্যাদি।

বিস্তৃতি : এ প্রজাতির গাছ বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, কম্বোডিয়া, লাওস, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত।

বাংলাদেশে প্রাপ্তি স্থান: বাংলাদেশে ধইল্যা গর্জন বিপদাপন্ন (Endangered) প্রজাতির গাছ। চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেট অঞ্চলের চিরসবুজ ও মিশ্র চিরসবুজ বনে বিক্ষিপ্তভাবে জন্মানো কতিপয় গাছ দেখা যায়। এ ছাড়া চট্টগ্রাম শহর এলাকার রেলভবন ও পাহাড়তলীর কৈবল্যধাম নামক স্থানে বড় আকৃতির শতবর্ষী কিছু গাছ রয়েছে। ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত জাতীয় উদ্যানের ৬নং সেকশনে লাগানো ধইল্যা গর্জনের কিছু গাছ সংরক্ষিত আছে।

গাছের বৈশিষ্ট্য:

- বড় আকৃতির চিরসবুজ বৃক্ষ, উচ্চতায় ৩০-৪০ মিটার এবং গাছের বেড় ৪-৫ মিটার পর্যন্ত হয়। এ গাছ ধীরে ধীরে বাড়ে।
- কাণ্ড সরল, সোজা, গোলাকার এবং প্রায় ২০ মিটার পর্যন্ত কাণ্ড শাখা-প্রশাখা বিহীন। গাছের মাথায় বিস্তৃত শাখ-প্রশাখা দেখতে ছাতার মতো মুকুট (crown) আকৃতির। বাকল মসৃণ ও সাদাটে ধূসর বর্ণের।
- পাতা আয়তাকার, লম্বায় ৯-২৫ সেন্টিমিটার, বোঁটাযুক্ত, সবুজবর্ণ, কিনার ঢেউ খেলানো, অগ্রভাগ সূচালো এবং স্পষ্ট শিরাবিন্যাসযুক্ত।
- জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে বাদামি বর্ণের ফুল ফোটে।
- ফল নাট জাতীয়, ডিম্বাকার এবং পৃষ্ঠভাগে পাতা সদৃশ ৩-৪টি উঁচু শির (Ridge) রয়েছে। ফলের শেষপ্রান্তভাগে পাতা সদৃশ পাতলা দুটি পাখনা (রিহম) সংযুক্ত। মার্চ-এপ্রিল মাসে ফল পরিপক্ক হয় এবং ধূসর বর্ণের হয়। পাকা ফল বৃন্তচ্যুত হলে ফলের পাখনায় বাতাস লেগে ঘুরতে ঘুরতে বহুদূর ছড়িয়ে মাটিতে পড়ে। প্রতিটি ফল একক বীজ বিশিষ্ট। প্রতি কেজিতে বীজের সংখ্যা ১৪০-১৫০ টি। বীজের আয়ুষ্কাল খুবই কম।

বীজসহ ধইল্যা বা ডুলিয়া গর্জন গাছ

ধইল্যা বা ডুলিয়া গর্জন এর চারা

প্রজনন ও বংশবিস্তার: সাধারণত বীজ এর মাধ্যমে এদের বংশবিস্তার হয়। ধইল্যা গর্জন গাছের বীজের আয়ুষ্কাল খুবই কম বিধায় সংগৃহীত বীজ দ্রুত সময়ে মধ্যে বপন করতে হয়। বীজ গজানোর (অঙ্কুরোদগম) হার শতকরা ৭০-৮০ ভাগ এবং ১০-১২ দিনের মধ্যে চারা গজানো সম্পন্ন হয়। উল্লেখ্য যে, বনাঞ্চলের বড় আকৃতির শতবর্ষী একটি মাতৃ গর্জন গাছ আশেপাশের ২০ হেক্টর বন ভূমিতে বীজ ছড়িয়ে দিতে পারে। অঙ্কুরোদগমের অনুকূল পরিবেশ বজায় থাকলে প্রতিটি মাতৃ গর্জন গাছ থেকে বনভূমিতে বছরে ১০-১৫ হাজার চারা পাওয়া যায়। এ সকল চারা প্রাকৃতিক উপায়ে বন সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

গুরুত্ব ও ব্যবহার: কাঠ বেশ শক্ত, মজবুত, টেকসই এবং হালকা খয়েরি বর্ণের। গৃহনির্মাণের খুঁটি, দরজা-জানালার ফ্রেম, আসবাবপত্র, বাস-ট্রাকের পাটাতন, ঘরের সিলিং ও প্যানেলিং জলযান, রেলস্লিপার ও কাঠের ব্রিজ তৈরিতে এই বৃক্ষের কাঠ ব্যবহার করা হয়। গাছের বাকল থেকে সংগৃহীত অলিওরেসিন (oleoresin) নামক প্রক্রিয়াজাত গর্জন তেল আদিবাসীরা আলো জ্বালাতে ও বার্নিশ এর কাজে ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া সনাতন পদ্ধতির চিকিৎসায় কম বয়সি গাছের বাকল বাতরোগ ও যকৃতরোগ নিরাময়ে ব্যবহার করে।

বাইট্টা বা শিল গর্জন:

বাইট্টা বা শিল গর্জন Dipterocarpaceae পরিবারের অন্তর্ভুক্ত দীর্ঘ বৃক্ষ প্রজাতির উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Dipterocarpus costatus* এবং ইংরেজি নাম- Yang ও স্থানীয় নাম বাইট্টা বা বাইট্যা গর্জন, শিল গর্জন, গুটি গর্জন, কেশো গর্জন, ছিকুনিয়া ইত্যাদি।

বিস্তৃতি: এ প্রজাতির গাছ বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, কম্বোডিয়া, লাওস, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত।

বাংলাদেশে প্রাপ্তি স্থান: বাংলাদেশে বাইট্টা গর্জন একটি বিপদাপন্ন (Endangered) প্রজাতির গাছ। চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার অঞ্চলের চিরসবুজ ও মিশ্র চিরসবুজ বনে বিক্ষিপ্তভাবে জন্মানো কতিপয় গাছ দেখা যায়। এ ছাড়া চট্টগ্রাম শহর এলাকার রেলভবন ও পাহাড়তলীর কৈবল্যধাম নামক স্থানে বড় আকৃতির শতবর্ষী কিছু গাছ রয়েছে।

গাছের বৈশিষ্ট্য:

- বড় আকৃতির চিরসবুজ বৃক্ষ, উচ্চতায় ৩০-৩৫ মিটার এবং গাছের বেড় ৩-৪ মিটার পর্যন্ত হয়। এ গাছ ধীরে ধীরে বাড়ে।
- কাণ্ড সরল, সোজা, গোলাকার এবং প্রায় ২০ মিটার পর্যন্ত কাণ্ড শাখা-প্রশাখা বিহীন। গাছের মাথায় বিস্তৃত শাখ-প্রশাখা দেখতে ছাতার মতো মুকুট (crown) আকৃতির। বাকল ঘন বাদামি বর্ণের এবং স্তরে স্তরে সজ্জিত।

বাইট্টা বা শিল গর্জন

বীজসহ বাইট্টা বা শিল গর্জন

- পাতা আয়তাকার, লম্বায় ১০-২০ সেন্টিমিটার, বোঁটাযুক্ত, সবুজবর্ণ, কিনার ঢেউ খেলানো, অগ্রভাগ সূচালো এবং স্পষ্ট শিরাবিন্যাসযুক্ত।
- জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে বাদামি বর্ণের ফুল ফোটে।
- ফল নাট জাতীয়, ডিম্বাকার এবং পৃষ্ঠভাগে পাতা সদৃশ ৪-৫টি উঁচু শির (Ridge) রয়েছে। ফলের শেষপ্রান্তভাগে পাতা সদৃশ পাতলা দুটি পাখনা (রিহম) সংযুক্ত। এপ্রিল-মে মাসে ফল পরিপক্ব হয় এবং তামাটে বা খয়েরি বর্ণের হয়। পাকা ফল বৃন্তচ্যুত হলে ফলের পাখনায় বাতাস লেগে ঘুরতে ঘুরতে বহুদূর ছড়িয়ে মাটিতে পড়ে। প্রতিটি ফল একক বীজ বিশিষ্ট। প্রতি কেজিতে বীজের সংখ্যা ১৭০-১৯০টি। বীজের আয়ুষ্কাল খুবই কম।

প্রজনন ও বংশ বিস্তার: সাধারণত বীজ দিয়ে বংশবিস্তার হয়। বাইট্টা গর্জন গাছের বীজের আয়ুষ্কাল খুবই কম বিধায় সংগৃহীত বীজ দ্রুত সময়ে মধ্যে বপন করতে হয়। বীজ গজানোর (অঙ্কুরোদগম) হার শতকরা ৮০ ভাগ এবং ১০-১২ দিনের মধ্যে চারা গজানো সম্পন্ন হয়। উল্লেখ্য যে, বনাঞ্চলের বড় আকৃতির শতবর্ষী একটি মাতৃ গর্জন গাছ আশেপাশের ২০ হেক্টর বন ভূমিতে বীজ ছড়িয়ে দিতে পারে। অঙ্কুরোদগমের অনুকূল পরিবেশ বজায় থাকলে প্রতিটি মাতৃ গর্জন গাছ থেকে বনভূমিতে বছরে ১০-১৫ হাজার চারা পাওয়া যায়। এ সকল চারা প্রাকৃতিক উপায়ে বন সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

গুরুত্ব ও ব্যবহার: কাঠ বেশ শক্ত, মজবুত, টেকসই এবং হালকা খয়েরি বর্ণের। গৃহনির্মাণের খুঁটি, দরজা-জানালার ফ্রেম, আসবাবপত্র, বাস-ট্রাকের পাটাতন, ঘরের সিলিং ও প্যানেলিং জলযান, রেলস্লিপার ও কাঠের ব্রীজ তৈরিতে এই বৃক্ষের কাঠ ব্যবহার করা হয়।

উৎস: অসীম কুমার পাল, বিভাগীয় কর্মকর্তা, বন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, বিএফআরআই, চট্টগ্রাম।

সম্পাদনা ও প্রকাশনা কমিটি

উপদেষ্টা : শামিমা বেগম	- পরিচালক (যুগ্ম সচিব)	অসীম কুমার পাল	- আহ্বায়ক
ড. ওয়াহিদা পারভীন	- সদস্য সচিব	মো: এমদাদুল হক	- সদস্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
ষোলশহর, চট্টগ্রাম।
E-mail : editorbfrinewsletter@gmail.com, web : www.bfri.gov.bd
ফোন : +৮৮-০২৪১৩৮০৭১৫, +৮৮-০২৪১৩৮০৭০১